সিঙ্গুর :
যে ক্ষতির পূরণ নেই

বিশেষ সমীক্ষা : সিঙ্গুরের দোবাঁদি গ্রাম

আগস্ট ২০০৭

মন্থন প্রকাশন

ভূমিকা

১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন আজকের দিনে কতখানি অচল, কতখানি তা গ্রামসমাজের এক বিপুল জনসমষ্টির বেঁচে থাকার অধিকারকে বেমালুম কেড়ে নিচ্ছে, সিঙ্গুরের গত এক বছরের আন্দোলন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একথা আন্দোলনের পক্ষে–বিপক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত শক্তিই কোন–না–কোনভাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু যেভাবে অধিগ্রহণের প্রশ্নে জমির মালিকদের সম্মতির বিষয়টি নিয়ে সরকার, বড়ো মিডিয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলি কথা বলেছে, নথিভুক্ত–অনথিভুক্ত ভাগচাষী এবং ভূমিহীন চাষীদের সম্মতি বা গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নটিকে মোটেই সেভাবে আমল দেওয়া হয়নি।

বাকি থেকেছে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন। ওই বর্জনীয় আইনের নিরিখে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে। কারণ, গ্রামে কে প্রকৃত চাষী, কে কতখানি ফসল ফলায়, সমৃদ্ধি আনে, সম্পদ সৃষ্টি করে, আর কার হাতে 'চাষী'–র তকমায় জমির প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা কার্যত স্বত্ব রয়েছে, তা নিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। সত্য উদ্‌ঘাটনের তর্ক–বিতর্কে ল্যান্ড ম্যাপ, ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, এমনকি সার্ভে–সেট্‌লমেন্টের কথাও এসেছে। জমি অধিগ্রহণে উদ্যত সরকার সেসবের যথার্থতা অস্বীকারও করেনি। কিন্তু 'উন্নয়ন'–এর যুদ্ধের মতো জরুরি সাজো রবে, সবই চাপা পড়ে গেছে।

আমরা সেই চাপা–পড়া–বাস্তবতার আনাচে–কানাচে কিছুটা খুঁজে ফিরছি সত্যকে। জানি সবটা আমাদের মতো ছোটো উদ্যোগে স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। কিন্তু ছোটো ছোটো উদ্যোগ ছাড়া কি সহমর্মী নিবিড় ও আন্তরিক অনুসন্ধান সম্ভব?

সিঙ্গুরের অধিগৃহীত অঞ্চলের সব ক'টি মৌজায় আমরা পৌঁছাতে পারিনি। যে ক'টি গ্রামে আমরা সমীক্ষার কাজ চালিয়েছি, তার মধ্যে দোবাঁদির প্রায় প্রতিটি ঘরে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে আমরা কথা বলেছি। ভূমিহীনদের দু'টি গ্রাম, দোবাঁদি ও রুইদাসপাড়ায় আমরা এর আগে গতবছর সেপ্টেম্বর মাসেও গিয়েছিলাম। জমির মালিক চাষীদের অবস্থান বুঝতে গিয়ে ভূমিহীনদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা বোঝার তাগিদ আমরা অনুভব করেছি। সেইদিক থেকে আমরা আমাদের বোঝাপড়ার একটা সামগ্রিকতা অর্জন করতে চেয়েছি। আর লাভ করেছি জমি অধিগ্রহণের ফলে গ্রামসমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মাত্রায় ঘটে যাওয়া অপূরণীয় ক্ষতি সম্পর্কে এক উপলব্ধি।

এই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন প্রশান্ত হালদার, রঘু জানা, আশিস মুখার্জি, অনুপম দাস অধিকারী, শুভপ্রতিম রায়চৌধুরি, মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন, অমিতা সান্যাল, জিতেন নন্দী, শমীক সরকার, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অনিতা মুখার্জি এবং নীলকমল বেরা। সমীক্ষার এই প্রতিবেদনমূলক দলিলটি সঙ্কলিত করেছেন অমিতা সান্যাল, জিতেন নন্দী ও শমীক সরকার।

আমরা দেখেছি, সিঙ্গুরে চাষকে ঘিরে জমির মালিক চাষী, নথিভুক্ত–অনথিভুক্ত বর্গাদার, ভূমিহীন খেতমজুর এবং এগুলির নানান মিশ্র–অবস্থান বা জট রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তরে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থের নানান রকম ঝোঁক ও ভিন্নতা। সবটা মিলে একটা আন্দোলন দানা বেঁধেছে। আবার সবরকম স্বার্থ জোটবদ্ধ হয়ে একটা গণআন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজের ভিতরে ও বাইরে দেখা দিয়েছে কতরকমই না প্রতিকূলতা। এদিক থেকে এই সমীক্ষা আমাদের একটা অধ্যয়ন–প্রক্রিয়াও বটে।

১৬ আগস্ট ২০০৭ সম্পাদক, মন্থন সাময়িকী

যেসব সংযোজনী এতে রয়েছে :

১. টীকা ও সংজ্ঞা
২. সিঙ্গুরে বিঘা প্রতি চাষের খরচ ও আয়ের গড়পরতা হিসেব
৩. দোবাঁদি গ্রামের এক অনথিভুক্ত ভাগচাষীর বর্গা রেকর্ডের জন্য আবেদনপত্র
৪. সিঙ্গুরে জাতপাত ও গড়পরতা আর্থিক অবস্থা
৫. দোবাঁদির একটি পারিবারিক বংশলতিকা
৬. জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ
৭. সমীক্ষায় প্রাপ্ত দোবাঁদির খেতমজুরদের তালিকা

দোবাঁদি থেকে শুরু ...

ক’পুরুষ আগে, কীভাবে এখানে বসবাস শুরু হয়েছিল কারোরই প্রায় মনে নেই। তবে প্রবীণদের স্মৃতিতে আবছা আভাষ কিছু পাওয়া যায়। বর্ষীয়ান খেতমজুর তারাপদ মৈত্রীর কথায় জানা যায় : প্রায় ২০০ বছর আগে পশ্চিমের দিক থেকে এসেছিল পূর্বপুরুষেরা, চাঁদাবিল বলে একটা জায়গা ছিল। ঠাকুর্দা ছিলেন রামগড়ের রাজার দারোয়ান। তারপর দল বেঁধে এখানে চাষের কাজ করতে এসে সব রয়ে গেল, বাসা বাঁধল এখানে এই বাঁধের ওপর এসে। চারদিকে চাষের মাঠ, মাঝে বাউরিদের গ্রাম দোবাঁদি।

কামারকুণ্ডু স্টেশন থেকে সিঙ্গুরের ট্রেকার–চলা রাস্তা বেড়াবেড়ি বাজার হয়ে আসছে দোবাঁদি। টাটার কারখানার পাঁচিল শুরু হওয়ার পর সেই অংশে রাস্তাটায় সদ্য পিচঢালা হয়েছিল। পিচঢালা রাস্তার গায়ে যেখান থেকে দোবাঁদি গ্রামটা শুরু, দক্ষিণ দিকের সেই অংশেই আদি বসবাস শুরু হয়েছিল বাউরিদের। কয়েকপুরুষে জনসংখ্যা বেড়েছে, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ ক্রমশ উত্তরের দিকে ডিভিসির বাঁধের ওপর উঠে এসেছে। পিছনে জুলকিয়া খাল, ওপারে জয়মোল্লা আর এপারে দোবাঁদি নিয়ে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত, তার একজনই পঞ্চায়েত সদস্য সুকুমার পাখিরা, থাকেন জয়মোল্লা পাখিরাপাড়ায়। দোবাঁদি গ্রামের গা–ঘেঁসে উঠেছে টাটার প্রজেক্টের উঁচু পাঁচিল। দোবাঁদি প্রাইমারি স্কুলের পাশ থেকে দক্ষিণ–পূর্ব কোণে এই পাঁচিলের ভেতরে প্রায় ৩৫০ মিটার দূরে দেখা যায় শ্মশান আর লাগোয়া আশ্রম। এখন তা অধিগৃহীত এলাকার অন্তর্গত। ক’মাস আগে যেদিন আটষট্টি বছরের খেতমজুর রমণী বিমলা খামারু মারা গেলেন, ছেলেরা যাচ্ছিল ঐ শ্মশানে পোড়াতে। প্রশাসনের বাধা পেয়ে লাশ গেল শেওড়াফুলি শ্মশানে।

গ্রামের পেছনদিক ছুঁয়ে টাটার পাঁচিল চলে গেছে জুলকিয়া খালের ধার ঘেঁষে, সোজা দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে পর্যন্ত। আবার খালের ওপার দিয়ে তার গা বরাবর পাঁচিল। এই জুলকিয়া খালের একপাশে কানা নদী, অন্য পাশে ঘিয়া নদী। ডিভিসির বানানো এই খালের গা দিয়ে বাঁধও ছিল দুদিকে। সেই বাঁধকে কেটে দিয়ে এই খালকে ৮০ ফুট চওড়া বানানো হয়েছে দোবাঁদির লাগোয়া অংশে। আবার এক্সপ্রেসওয়ের কাছের অংশে,

যেখানে খাল অনেক চওড়া ছিল, সেখানটাতে বাড়তি প্রস্থ বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। ওটা এমনভাবে সংস্কার করা হচ্ছে যাতে টাটার প্রজেক্টের জন্য জল নিয়ে আসা যায়। এই খালের গা দিয়েই বেশ ক'টি বড়ো বড়ো পুকুর ছিল। সেসব পড়ে গেছে অধিগৃহীত অংশে। সব বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ষায় সেসব পুকুর আর খালে মাছ আসতো প্রচুর। আশ্বিন কার্তিক মাসে, যখন মাঠের কাজ আর থাকে না, তখন এই মাছ ধরে চলত দোবাঁদির মানুষের। ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মাছ পাওয়া যেত। নিয়ন্ত্রিত খাল আর লাগোয়া পুকুর বুজিয়ে দেওয়ায় এ বর্ষায় মাছ আর খুব আসেনি এখনও। এখন যেখানে হাই রোড হয়েছে, ওখানে ছিল ঝোপ আর তার দু'ধারে খাদ। দোবাঁদির লোকেরা যে যার মতো জাল ফেলে তাতে মাছ ধরত।

গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে যখন দোবাঁদিতে এলাম, আমরা এসেছিলাম রুইদাসপাড়া থেকে পায়ে হেঁটে। সেই রাস্তাটা এখন টাটার পাঁচিলের ভেতর। বাইরে দিয়ে নতুন পিচঢালা রাস্তা ধরে এবারে আমরা ট্রেকারে চেপে মনসামাতা ক্লাবের মুখে সোজা এসে নেমেছি। ক্লাবের পিছনে মনসাতলার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে সাইকেল ভ্যানগুলো। সেবার ওখান থেকেই আমাদের আলাপ শুরু হয়েছিল গ্রামবাসীদের সঙ্গে। আলাপ বলতে, সামান্য কথা এগোতে না এগোতেই জড়ো হয়ে গিয়েছিল বহু মহিলা, যারা সকলেই লাগোয়া মাঠে চাষের কাজ করত তখন, তারা তখন ছিল আন্দোলনের ভরপুর মেজাজে। আর এবার, একবছর পর, গোটা গ্রামটা যেন ঝিমোচ্ছে। লড়াইয়ের মেজাজ এখন অনেকটাই দীর্ঘশ্বাসে রূপান্তরিত।

তবু আমরা কথা এগোই। আমাদের তো জানতেই হবে জমি অধিগ্রহণের প্রায় একবছর পর কীভাবে দিন কাটছে সিঙ্গুরের মানুষের। দোবাঁদি সিঙ্গুরের এক গরিবপাড়া।

গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে আমরা আমাদের নমুনা ক্ষেত্রসমীক্ষা শুরু করেছিলাম প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া থেকে, শেষ হয়েছিল দোবাঁদিতে এসে। এবার আমরা শুরু করলাম দোবাঁদি থেকে, ১৪ জুলাই ২০০৭। প্রথমদিন দোবাঁদিতে কিছু কথা বলেই আমরা বুঝতে পারি, সিঙ্গুরে টাটার প্রজেক্টের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই ক্ষতির গভীরতা ও মাত্রা আন্দাজ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই দোবাঁদি গ্রামের পরিবারগুলোর সম্পূর্ণ সমীক্ষা করা দরকার।

অতএব, ১৪ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত বেশ কয়েক দফায় আমরা সমীক্ষা চালাই। দোবাঁদির প্রায় প্রতিটি ঘরেই আমরা গেছি। এছাড়া আমরা কথা বলেছি জয়মোল্লা, যমপুকুর, রুইদাসপাড়া, মধ্যপাড়া, ঘোষপাড়া, পূর্বপাড়ার সামান্য কিছু বাসিন্দাদের সঙ্গে।

টাটার পাঁচিল তোলার আগে দোবাঁদি

দোবাঁদি গ্রামে বাউরি সম্প্রদায়ের বাস। মাত্র একঘর বাগদি (বর্গক্ষত্রিয়) রয়েছে, যারা বছর পনেরো আগে জুলকিয়া খালের ওপারে ধাড়াপাড়া থেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিল। বাউরিদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পদবির পরিবার : পাত্র, মৈত্রী, দাস খামারু, হাজারী, কোটাল, বাগাল, মালিক, বৈরাগী, সর্দার, ধীবর, এবং দিগর। এদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, খাওয়াদাওয়া, বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। নব্বই ঘর মানুষ সম্পূর্ণত কৃষিজীবী, চাষ-নির্ভর। ব্যতিক্রম হিসেবে দু-একটি পরিবার বাদ দিলে এদের হাতে কোনও জমি নেই, আগেও ছিল না। এমনকি, একটি পরিবার বাদে নথিভুক্ত ভাগচাষিও (রেকর্ডেড বর্গাদার) গ্রামে দ্বিতীয়টি নেই। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল গড়ে উঠেছে। সেখানে বাচ্চারা সামান্য কয়েক ক্লাস লেখাপড়া শেখে। তারপর একটু বড়ো হতে না হতেই লাগোয়া মাঠে চাষের কাজে লেগে যেতে হয়। প্রত্যেক পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা সকলেই মাঠে কাজ করে। সেভাবে বললে, চাষের মধ্যেই এই বাউরিপাড়ার মানুষের জীবন। তাদের নিজস্ব বলতে নব্বইটি ভিটে। দু-তিনটি বাদে প্রায় সবই মাটির ঘর, টালি বা খড়ের চাল। সারিবদ্ধ ঘরের সামনে দিয়ে মাটির রাস্তা। বর্ষায় কাদায় তাতে হাঁটা দুষ্কর। গ্রামে একটি পাকা তিনতলা বাড়ি কানাই সর্দারের। তিনি ভাগচাষি। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দু'জন নৈনিতালে সোনা পালিশের কাজ করছে দশ বছর যাবৎ। এছাড়া গ্রামের মানুষের বাইরের কাজে যাওয়ার তেমন রেওয়াজ নেই। আর এক পাকা বাড়ি সীমন্ত পাত্রের, মোটরগাড়িও আছে। বাউরিপাড়ায় চোখে পড়ার মতো স্বচ্ছল অবস্থা তাদের।

দশ বছর আগে স্বামী মারা গেছেন, এমন এক গৃহকর্ত্রী বিজয়া পাত্রের নিজস্ব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট চিত্রটা পাওয়া যায় :

আমাদের বাড়ির অনেক ফ্যামিলি তো , আমি বিয়ে হয়ে এসে কয়েক বছর মাঠের কাজ করিনি। কেন কাজ করিনি? বাড়িতে রান্না খাওয়ার জন্য একটা লোকের প্রয়োজন। দেওর ননদ সব বাচ্চা-বাচ্চা ছিল তো , তাদের জন্য আমি মাঠে বেরোতে পারতাম না। শাশুড়ি যেত , শ্বশুর যেত , স্বামী দেওর সকলেই যেত মাঠে। বাড়ির আঠারো জনের ফ্যামিলি। বছর তিনেক বাড়িতে ছিলাম। বছর তিনেক পর আমি চাষের কাজে নেমেছি।

কাছে পিঠেই কাজ করা হত। এখন যে পাঁচিল দিয়েছে , তার ভিতরেই কাজ হত। তখন ৬ টাকা রোজে কাজ করেছি। কিন্তু এত অভাব ছিল না। আর এখন ৫০ টাকা রোজে কাজ করেও অভাব মিটছে না। খেতমজুরির রোজ কোন আন্দোলন করে বাড়েনি , আপনাআপনিই হয়েছে। যখন চাষের কাজ বাড়ত , বছর বছর কিছু কিছু করে বাড়ত। চাল ডালের দাম বাড়তে লাগল , আনাজপাতির দাম বাড়তে লাগল , তখন ৬ টাকা থেকে হল ১০ টাকা, তারপর ১৫ টাকা , তার থেকে ২০ টাকা , বছরে পাঁচ টাকা করে বাড়তে বাড়তে এখন ৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আগে আমাদের মাঠে কাজ হত আট-দশ মাস বছরে। এই ধরুন , অঘ্রান মাসটা হত , পৌষমাসটা দশ-পনেরো দিন ধান ঝাড়া হত , পৌষ মাসটায় পুরোটা পাওয়া যেত না , কিছুটা ধান ঝাড়া হত। মাঘ মাসটায় অফ-সিজন [বোরো ধান] চাষ হলে পরে , মাঘ মাস থেকে ফাল্গুন মাসের দশ-পনেরো তারিখ অবধি , দু' মাস মিলিয়ে ধরুন একমাস মতো কাজ হত। চৈত মাসটায় আট-দশদিন নিড়ানোর কাজটা হত। এই কাটা-ঝাড়া নিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসটার মাঝামাঝি অবধি হত। আষাঢ় মাসে টুকটাক দু-চারদিন হয়ত হয়। এখানে শ্রাবণ মাসে আমাদের কাজটা হয়। সেটা বস্‌তিই ধরুন , দু-পাঁচ দিন তো এমন কিছু নয়।

আমাদের এখানে মেয়েছেলেদের অন্য কাজের কোন লাইন ছিল না। আমি করি কী রকম? আমার স্বামী মারা গেল , বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করতে হবে। মেয়ে ছিল , বিয়ে দিতে হবে। বড়দা [বড়ো ভাসুর] যেমন ঘুনি বসায় , আটুল বসায় — শিঙি মাগুর ভালো মাছ ধরার একটা যন্ত্র , বাঁশের , হাতে তৈরি করে — বড়দার দেখে দেখে আমিও করতাম। নাহলে আমার ছেলেমেয়েরা খাবে কী? আমাকেও চেষ্টা করতে হবে। দু-চার খানা [বাঁশ] কিনে আমিও চেষ্টা করতে থাকলাম। করতে করতে যাই হোক শিখে গেলাম। [মাছ ধরে] এই বেড়াবেড়ি বাজারে , কোনদিন হয়ত ১ কিলো , কোনদিন পাঁচশো , যা নিয়ে যাব বিক্রি হবে। দুটো মাছ ধরলে , মাঠ থেকে হয়ত দুটো শাক তুলে , শামুক কুড়িয়ে ... মোট কথা , যা নিয়ে যাবেন , আমাদের বেড়াবেড়ি বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। আপনার সংসারটা কোনরকমে চলে যাবে। এই ভাদ্র আশ্বিন মাসটায়। কষ্ট আমাদের সব থেকে এই কার্তিক মাসটায়। আশ্বিন মাসটায় তবু শাক শামুক পাওয়া যায়। কার্তিক মাসটায় কিচ্ছু থাকে না। তখন জলটল শুকিয়ে যায় , মানুষের খুব ধারদেনা , খুব অভাব হয়। বন্ধকে সুদে ধার দেয় ওই সাহারা। এদের কাছ থেকে সুদের ওপর জিনিস

দিয়ে টাকা নেওয়া হয়। আবার যখন কাজ হয় , টাকা দিয়ে জিনিস ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ...

শুধু বিজয়া পাত্রেরই নয়, এগারো মাস আগে কমবেশি এমনটাই ছিল এই গ্রামের জীবন চক্র।

দোবাঁদির পরিবারগুলো বছরের আট-দশ মাস চাষের কাজে যুক্ত থাকত। বাকি সময়টায় অনেকখানি সাহায্য মিলত জুলকিয়া খাল আর পুকুরগুলো থেকে, মাছ ধরে। পাড়ায় ঢুকলেই দেখা যায়, ঘরে ঘরে লোক জাল বুনছে, বাঁশের কঞ্চি কেটে নানান মাছ ধরার উপযোগী ঘুনি, আটুল, বেটো তৈরি করছে — এগুলো সবই মাছ ধরার প্রস্তুতি। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক পরিবারে ধারদেনা হত চাষের অফ-সিজনে। আবার ঠিকমত চাষের কাজ চললে, সমস্ত খরচ বাঁচিয়ে সঞ্চয়ও হত কমবেশি, কারও পোস্ট অফিসে, কারও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে।

এছাড়া লোকে ঘরে ছাগল, হাঁস, মুরগি পালন করে। এগুলোও অসময়ের সঞ্চয়। বিয়ে-থা, বিপদে-আপদে হঠাৎ করে মোটা টাকার দরকার পড়লে এগুলি বিক্রি করে টাকা জোগাড় হত।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, দোবাঁদির প্রত্যেক পরিবারে দুই বা ততোধিক খেতমজুর রয়েছে। জোয়ান ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ মাঠে মালিকের পাওয়ার টিলার (ছোটো ট্রাক্টর) চালিয়ে ভালো টাকা আয় করত। আর ছিল প্রায় দশটি সাইকেল ভ্যান। ভ্যান চালিয়েও কেউ কেউ সংসার টেনে নিত। খেতমজুরদের অনেকেই জমির মালিকের কাছ থেকে এক একটা ফসলের সিজনে জমি নিয়ে ভাগে চাষও করত। আমন (সিজন)-এর সময় খুব একটা পাওয়া যেত না, বোরো (অফ-সিজন) ধানের চাষে ভাগে জমি পাওয়া যেত। অধিকাংশই বারুই, সাহা আর ঘোষেদের জমি। জমির মালিকরা ফসল অনুযায়ী প্রতি বছর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জমি ভাগচাষের জন্য লিজ বা ঠিকায় দিত। একই লোককে সাধারণত লাগাতারভাবে ভাগে দেওয়া হত না। পাড়ার লোকেরা এই জীবিকাকে বলে 'ভাগে ভুতে খাওয়া'।

দোবাঁদি গ্রামের সবচেয়ে বড়ো উৎসব মনসা পুজো। এটা ধুমধাম করে সমবেতভাবে উদ্‌যাপন করা হয় প্রতিবছর। সকলে জড়ো হওয়ার আর একটি জায়গা হল মনসাতলার পাশেই ক্লাবঘর, মনসামাতা ক্লাব। সদ্য

প্রয়াত যুবক শঙ্কর দাস* ছিলেন এই ক্লাবের এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। আগে ক্লাবের মোটা টাকার তহবিল ছিল। বিয়ে-থা, অসুখ-বিসুখে, বিপদে-আপদে ক্লাব পাড়ার লোকের পাশে দাঁড়াত। তহবিল সংগ্রহের জন্য সকলে মিলে খেটে, যেমন ধান বা মাছ বিক্রি করে টাকা জোগাড় হত। গ্রামের ভিতর রয়েছে বড়ো গোমস্তাপুকুর। আগে ঘোষপাড়ার বদ্যিনাথ গোমস্তা, পূর্ণ গোমস্তাদের দখলে ছিল এই পুকুর। ক্রমে ঘোষেদের বহু পরিবারের ভাগে জড়িয়ে যায় এর মালিকানা। আগে এই পুকুরে গ্রাম হিসেবে ভাগে মাছ চাষ করা হত। এখন ক্লাবের ছেলেরাই মাছ চাষ করে গোমস্তাপুকুরে। এরকম মাছ বিক্রি করেই ক্লাবঘর বানানো হয়েছে।

দোবাঁদিতে একসময় মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা রাম চ্যাটার্জির যাতায়াত ছিল। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ভাইপো জয় চ্যাটার্জিও যেতেন। এখন অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রভাব।

অধিকাংশ পরিবারে গ্রামেই ধাইমা হিসেবে প্রসূতি মায়েদের বাচ্চা প্রসব করান এখানকার খেতমজুর পরিবারের বৌ ভারতী দাস। তিনি সেবামূলক মনোভাব নিয়েই কাজটা করেন, ব্যবসা হিসেবে নয়। অসুবিধা বুঝলে রোগীকে সিঙ্গুর হাসপাতালে পাঠান। ওঝা হিসেবে ঝাড়ফুঁক ও পুজো পাঠ করেন প্রবীণ গ্রামবাসী সূর্যকান্ত মৈত্রী।

টাটার পাঁচিল তোলার পরে দোবাঁদি

গ্রামবাসীদের হিসেব মতো আজ এগারো মাস চলছে দোবাঁদির দুর্দশার পর্ব। প্রথমে শালখুঁটি পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল। তারপর তোলা হল ইঁট গেঁথে উঁচু পাঁচিল। সবটাই টাটার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম, যাকে স্থানীয়রা বলে 'শিল্প নিগম' তার তৎপরতায়। যে মাঠকে ঘিরে গড়ে ওঠা দোবাঁদি গ্রাম, তার অনেকটাই চলে গেল পাঁচিলের আড়ালে, নাগালের বাইরে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠলেই আগে দেখা যেত দিগন্ত বিস্তৃত ফসলে ভরা সবুজ মাঠ, আর এখন চোখের সামনে জেলখানার মতো অবাধ্য পাঁচিল।

---

* ৪২ বছর বয়স্ক শঙ্কর দাসের অকালমৃত্যু হয়েছে ২ জুলাই ২০০৭। মৃত্যুর আগে অভাব তো ছিলই, মেয়ের বিয়ের জন্য অর্থের ব্যবস্থা নিয়েও বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। ১৩ জুলাই সেই মেয়ের বিয়ে হয়। দ্রষ্টব্য, সংযোজনী ৭, ক্রম ৫৮।

এখন আষাঢ় পেরিয়ে ভরা বর্ষার শ্রাবণ মাস। মাঠে মাঠে মেয়েদের ধান রোয়ার সময়। সেই মাঠগুলো এখন অধিগৃহীত হয়েছে গাড়ি কারখানার জন্য। পাঁচিলের ভিতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারই তোড়জোড় চলছে। অগত্যা দোবাঁদির মেয়েরা ক্ষোভ আর হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চোখের জল সামলে চলেছে হাইরোড পেরিয়ে। ভোরবেলা উঠে রওনা হলে ঘন্টাখানেক ঘন্টা-দেড়েকের পথ পেরিয়ে তবে সব চাষের মাঠ। দোবাঁদি গ্রামে দাঁড়িয়ে দূরে দেখা যায় হাইরোড — দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, রঙীন স্বপ্নের উন্নয়নের রাজপথ! সেটা পার হয়ে নীলের পাড়, পাটন, পায়রাওড়া, চৌখণ্ডীপোতা, বাবুরভেড়ির মাঠে মাঠে কাজের খোঁজে ঘোরে দোঁবাদির মেয়েরা। যদি কাজ জোটে ৪০ টাকা রোজ এখন, টেনে দেড়া কাজ করতে পারলে ৬০ টাকা। ৭ গণ্ডা বীজ (২৮টা) মেরে পুঁতলে ১টা রোজ, কাজ পেলে বড়ো জোর দেড়টা রোজ করা যায় একদিনে। গতবছরও ছিল ঘরের দাওয়া থেকে নামলেই হাতের নাগালে অনেক কাজ। আগে এই সময়টাই মেয়েরা দৈনিক ৭০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করত। এবছরে এই কাজটা থাকবে আর ৭-১০ দিন। তারপর আবার বেকার। ছেলেরা অধিকাংশই বেকার, কোন কোন দিন বাইরে কোথাও সামান্য কাজ জুটছে। কেউ কেউ দূরে দূরে গিয়ে সামান্য ট্রাক্টর চালাচ্ছে। ভ্যানগুলো, হয় বাড়িতে বসে আছে, নষ্ট হচ্ছে, আর নয় অভাবের তাড়নায় অল্প দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে এই পাড়ায় বিমলা খামারু আর শঙ্কর দাস মারা গেছে। দুঃসহ অবস্থাটার একটা নমুনা পাওয়া যায় বিজয়া পাত্রের বর্ণনায় :

আমার এই ছেলের [বড়ো ছেলে গৌতম পাত্র] দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। একটা বাচ্চা ছিল। টাটা হওয়ার পর থেকে বৌমা এখানে অশান্তি দেখে সংসার করল না। ওর বাড়ি হাওড়া জেলায়। সে মেয়ে ভয়েতে এখানে সংসার করল না। বাচ্চাটা নিয়ে সেখানে [বাপের বাড়িতে] ছিল। একবছরের বাচ্চা , অসুখ করে সেখানে মারা গেল। অনেকবার যাওয়া আসা হল আনতে। বলল , এখানে যদি তোমার ছেলে থাকে , সংসার করব। বাচ্চাটার নিমোনিয়া হয়েছিল। আসলে বৌমা বাচ্চা নিতে চায়নি। আমাদেরই জন্য জোর করে ... যখন বাচ্চা এসেছিল , বিষ খেয়েছিল। সেটা মেরে ফেলার জন্য। তখন যা হয় করে ধার দেনা করে , হাজার তিনেক টাকা মতো খরচা হল। ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে বলা হল , বাচ্চাটা যেন

নষ্ট না হয়, আপনারা সেই ব্যবস্থা করুন। বাচ্চা বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাটা হল রুগ্ন। বৌমা তাকে বুকের দুধ দিত না। ...

এরকমই সব করুণ কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে দোবাঁদির ঘরে ঘরে। পাঁচিলে ঘেরা মাঠে খেতমজুরি বন্ধ। ভ্যান চালিয়ে আনাজ ফসল বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ বন্ধ। এগুলোই ছিল দোবাঁদির প্রত্যেক ঘরে সংসার চালানোর উপায়। সমস্ত উপায়ই আজ বন্ধ। এই জমির ওপর নির্ভরশীল রোজগেরে মানুষের সংখ্যা দোবাঁদিতে প্রায় ৩০০।

টাটার গাড়ি কারখানার জন্য যাদের ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয়েছিল, তাদের একজনও দোবাঁদি থেকে যায়নি। মাত্র একজন ছাড়া, দোবাঁদির প্রায় ৩০০ কর্মক্ষম মানুষ কেউই এই মাঠে শিল্প নিগম বা টাটার এখনকার কোন কাজ — রাত পাহারা, মাটি কাটা ইত্যাদি পায়নি। যাদের ডাকা হয়েছিল তারাও মোটেই যেতে রাজি হয়নি। ফলে অধিগ্রহণের এক ধাক্কায় হঠাৎ করে কর্মরত কয়েক'শ মানুষ বেকার হয়ে গেছে। অনাহারের জ্বালায় লোকে ধারদেনা করছে। আগে মাঠে কাজ করলে, যার কাজ বা জমি, তার কাছ থেকেই অগ্রিম হিসেবে ধার নেওয়া যেত। এখন সে রাস্তাও বন্ধ। অতএব ঘরের জিনিস বন্ধক রেখে সুদে ধার নিচ্ছে পরিবারগুলি। ঘরের কাঁসা পিতলের থালা-বাসন, কলসি, মেয়েদের কানের সোনা-রূপার মাকড়ি, কোমরের বিছে, আংটি, গলার হার বন্ধকে চলে যাচ্ছে সাহাদের হাতে। সুদের রেট হল সোনার গয়নায় মাসে ৩%, রূপায় মাসে ১০%-এর মতো।

জোয়ান ছেলেরা কাজের সন্ধানে বেরোতে শুরু করেছে বাইরে বাইরে। একে অনভ্যাস, তায় যুৎসই কাজ পাওয়াও এখন সহজ নয়। যা পাওয়া যাচ্ছে, তাও অনিয়মিত, অনিশ্চিত। তাতে রোজগার আগের তুলনায় বেশ কম। অধিগৃহীত এলাকার চাষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিবার সিঙ্গুরে আর কোন পাড়ায় এতটা দেখা যায় না। বিশেষত, এখানকার বাউরি মেয়েরা যেভাবে প্রত্যেক ঘরেই চাষের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তেমনটা অন্য কোন গ্রামে নেই। সুতরাং হঠাৎ করে একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের ধাক্কা এসে পড়েছে এখানকার প্রত্যেক পরিবারে। আর সেই সঙ্কট ছড়িয়ে পড়েছে এখানকার সামাজিক জীবনের সমস্ত আনাচে কানাচে। ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় অবস্থাটা।

দূরের মাঠ থেকে রোয়ার কাজ সেরে মেয়েরা ঘরে ফিরছে দুপুর পেরিয়ে। দুপুর গড়িয়ে তবে হয়ত ভাত রান্না। একবেলা উনুনে হাঁড়ি চড়ছে অনেক ঘরেই। রেশনের ৭ টাকা কেজি চাল ব্ল্যাকে ১১ টাকায় কিনে এনে তাই ফুটিয়ে নিয়ে কোনমতে চলছে। যখন কোন ঘরে চলছে না, তখন 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র সামান্য সাময়িক রিলিফের চাল। কিন্তু রিলিফ নিয়ে কি সংসারের চাহিদা মেটে? শোনা যাচ্ছে, পাঁচিলের বাইরে আশেপাশের জমিগুলিও সব দালাল মারফত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে চড়া দরে। গ্রামটার অবস্থা যেন এক চক্রব্যূহ!

এই সঙ্কট মুহূর্তে সামান্য খুদকুঁড়োর মতো হলেও 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প'-এর একশ দিনের কাজ ও জব কার্ডের বিষয়টি এসেছে দোবাঁদির কর্মহীন মানুষের কাছে। জুলাই মাসের প্রথম দিকে শঙ্কর দাস মারা যাবার পর পরই এই প্রকল্পে কাজ দেওয়া হয়। আগেই ৯০ জনকে জব কার্ড দেওয়া হয়েছিল। ধান লাগানোর ও পাট কাটার মরসুম চলছে এখন। সেই সুবাদেই দূরে দূরের মাঠে হলেও চাষের কাজ ওই সময়টাতে যে একদম ছিল না তা নয়। তথাপি জনা চল্লিশ গিয়েছিল একশ দিনের কাজে। সর্বমোট ৫-৬ দিন কাজ হয়েছে। বন দপ্তর থেকে এসে নির্দেশ দেয়, আগাছা-ঝোপঝাড় চেঁছে গাছ লাগানোর জন্য। ১ দিনে ৬ জনে ৫০০ ফুট চেঁছে দেড় ফুট গভীর গর্ত করে তাতে ১০০টা গাছ লাগাতে হবে, তারপর তাতে জল দিতে হবে। সেই একশ দিনের কাজে এই গ্রামের যারা গেছে, তারা সবাই বলল, একাজ একদিনে ৬ জনে অসম্ভব। যাই হোক, একমাস হয়ে গেছে কাজের। এখনও একটা পয়সাও পায়নি দোবাঁদির মানুষ। পঞ্চায়েত সদস্যের খোঁজ নেই। প্রধান তাদের কথায় পাত্তা দেন না।

রুইদাসপাড়া

রুইদাসপাড়ায় ১২০ ঘর মতো লোকের বাস। এপাড়ায় থাকে রুইদাস অর্থাৎ চর্মকাররা। কিছু ঢাকিও রয়েছে, যারা ঢাক বাজায়। বেশিরভাগেরই নিজস্ব জমি নেই। যাদের কিছু আছে, তার পরিমাণ খুব অল্প। আগে কেউ হয়ত বাদ্যকার হিসেবে দেবোত্তর জমির অংশ পেয়েছে। ভাগে চাষ করে যারা, তাদের বেশির ভাগেরই বর্গা করা আছে। তারা সবাই ক্ষতিপূরণ

পেয়েছে। এ গ্রামে যারা ক্ষতিপূরণের আওতায় ছিল, তারা সবাই ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে বা নিয়ে নিয়েছে। প্রায় ১১৫টা ভ্যান ছিল এখানে। এখন কমছে। ৫–৬ ঘর বাদে শিল্প নিগমের পুরুষ-মহিলা সবাই যাচ্ছে। মূলত পাহারার কাজ — ছেলেদের, তাছাড়াও আছে মাটি কাটা এবং নির্মাণ কাজের জোগাড়ের কাজ। ৭২ টাকা করে রোজ। অনেকে ছোটো ছোটো ছেলেদেরও নাম লিখিয়েছে শিল্প নিগমের কাজে, হাজিরা দিলেই রোজ। আর নামটাও লেখানো দরকার, পরে কারখানা হলে হয়ত কাজে লাগবে। প্রজেক্টের কাজে প্রথম প্রথম অনেকে দিনে দুটো করে পাহারার ডিউটিও দিয়েছে। তারপর নিয়ম হয়ে গেছে, একটার বেশি ডিউটি দেওয়া যাবে না। তবে ইদানীং পাহারার কাজ কমছে। কিছু কিছু মানুষ এক সপ্তাহ কাজ পাচ্ছে, এক সপ্তাহ বাদ। বর্গাদার যারা, তারা ২৫% 'বখরা' পেয়েছে।

রুইদাস পাড়ায় শিক্ষিত লোক আছে বেশ কিছু। আগে এখানে অনেকে ঢালাইয়ের কাজ করত। এখন তারা টাটার প্রজেক্টে ঢুকে গেছে। আগে এপাড়ার মহিলারা বাইরে কাজ বলতে কেবল লোকের বাড়ি কাজ করত। মহিলাদের আরেকটি কাজ ছিল ধান কুড়ানো বা আলু কুড়ানো। জমি থেকে ফসল তুলে নেবার পর গোটা জমি ঝেঁটিয়ে কিছু ধান বা আলু পাওয়া যায়। ধান পাওয়া যায় বিঘেতে ২–৩ বস্তা। ঘরে রেখে দেওয়া হয়। আলু কুড়িয়ে বেড়াবেড়ি বাজারে বিক্রি করা হয়। অথবা কয়েক ঘর মিলিয়ে কোল্ড স্টোরে রাখা হয়। প্রতিটি প্যাকেটে নাম লেখা থাকে, কোন ঘরের সেটা। এ পাড়ার মহিলারা বললেন, দোবাঁদিতেও কিছু মহিলা এ কাজ করে। এখন ঘরের লাগোয়া জমি ঘিরে দেওয়ার ফলে, এ কাজটা আর থাকছে না। বিধবা গৃহবধূ আরতি রুইদাস বললেন, টাটা আসার পর গ্রামে বিবাদ বাড়ছে, হুজ্জোতি বেশি হচ্ছে, ভ্যানের কাজ, চাষের কাজ কমে যাচ্ছে। মদ খাওয়া বাড়ছে। তার নিজের বাড়িতে একটা রিক্সা, আর দুটি ট্রলি ছিল। এখন একটা ভ্যান কম দামে বিক্রি হয়ে গেছে, আর একটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ছোটো ছেলে এসব দেখে এই বৈশাখেই মাদ্রাজ চলে গেছে, সোনা রূপার দোকানে কাজ করতে। তাছাড়া এই পাঁচিল হবার পরে ধান, আলুর দাম বেড়ে গেছে। এই মাঠেরই ধান-আলু স্থানীয় দোকান বাজারে পাওয়া যেত।

রুইদাসপাড়ায় সিপিএমের সংগঠন জবরদস্ত, এবং অনেকদিনের। গ্রামে একটা লাইব্রেরি ঘর আছে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ পাঠাগার, ১৯৭৮ সালে স্থাপিত। বই নেই, সেটা এখন ক্লাবঘরের মতো হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ভাগচাষীর বর্গা রয়েছে। এ পাড়ার একটা বদনামই আছে, ভাগে জমি দিলেই রেকর্ড হয়ে যায়। তাই মালিকেরা বড়ো একটা ভাগে চাষ করতে দিতে চায় না। জুলাইয়ের মাঝামাঝি এখানে ১০০ দিনের কাজ হয়েছে দুদিন। ৩০–৪০ জন কাজ করেছে। রাস্তার গায়ের আগাছা পরিষ্কার করেছে। তবে টাটার জমিতে কাজ করছে না যে ক'টি পরিবার তারা কেউ জব কার্ড পায়নি।

মধ্যপাড়া

মধ্যপাড়ায় প্রায় ১০০ ঘরের মতো বাগদি (বর্গক্ষত্রিয়) থাকে। তাদের মধ্যে ৫০–৬০ ঘর ভূমিহীন। তবে জমির ওপর তারা খুব একটা নির্ভরশীল নয়। কাজ বলতে আছে বাজারে জমির সবজি বিক্রি করা। পাঁচিল ওঠার পর এখন কাঁচা আনাজের ব্যবসায় মন্দা। মহিলাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ বড়লোকদের (যেমন, ঘোষেদের) বাড়িতে কাজ করতে যায়। ১০–১২ ঘরে ভ্যান আছে। এই ৫০–৬০ ঘর ভূমিহীনের মধ্যে কিছু ঘর ভাগে চাষ করত। তাদের কারোর কারোর, সংখ্যাটা কম, বর্গা রেকর্ড করা ছিল। তারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগেরই বর্গা রেকর্ড করা নেই।

টাটার পাঁচিল গাঁথার ফলে এ-গ্রামে পরিবর্তন বড়ো একটা হয়নি। বাগদিদের মধ্যে অনেকেই শিল্প নিগমের কাজে যাচ্ছে। বেশির ভাগই পাহারার কাজ, মাটি কাটা, নির্মাণ কাজের জোগাড়ে। একই মাইনে। ওদেরকে বোঝানো হয়েছে, এখন থেকে কাজ করলে পরে কাজ পাবি।

বাগদি পাড়ায় শিক্ষাটা কম। প্রাইমারি অবধিই বেশির ভাগের পড়াশুনা। দু-একজনের মাধ্যমিক অবধি আছে। পড়াশুনার খরচ চালানো মুশকিল। তাছাড়া ছোটোবেলা থেকেই কাজে লেগে যেতে হয়। এ পাড়ায় একটা পুরানো লাইব্রেরি আছে সাহাদের নামে। সাহারাই তৈরি করেছিল। তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করত। এখন আর করে না। বইপত্র আছে, তবে তার বেশির ভাগই উইতে কেটে দিয়ে গেছে।

বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া

বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়ায় ১৫৫ থেকে ১৬০ ঘর মানুষ থাকে। এক ঘর কেবল তফসিল (মাঝি), বাকি সবাই মাহিষ্য। গ্রামসভার নাম খাসের ভেড়ি। বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া আর খাসের ভেড়ি মিলিয়ে এই গ্রামসভা। কেবল এই গ্রামসভায় তৃণমূল সদস্য, তাঁর নাম দুধকুমার ধাড়া। বেড়াবেড়ি পঞ্চায়েতটা সিপিএমের। গ্রামে কয়েক ঘর ভূমিহীন, তা বাদে প্রায় প্রত্যেকেরই কম বেশি নিজস্ব জমি এবং ভাগে চাষ। নথিভুক্ত বা রেকর্ডেড বর্গাদার এক ঘর। তারা ক্ষতিপূরণের চেক নেয়নি, আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আছে। জানা গেছে, এই গ্রামের অল্প কিছু লোক ক্ষতিপূরণের চেক নিয়েছে প্রথম দিকেই। "যারা সরকারি পার্টির অন্ধ ভক্ত তারাই জমি দিয়েছে। তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং গরিব, দু'ধরনের লোকই আছে। আবার এযাবৎ সিপিএম করে এসেছে, এমন লোকও জমি রক্ষার আন্দোলনে শামিল হয়েছে।"

এখানে সবারই নিজস্ব বাস্তু, পাট্টা জমি নয়। জমির পরচা বা দলিল আছে। পৈতৃক জমি ছাড়াও চাষ থেকে আয় করেও অনেকে জমি কিনেছে। গত ১০–১৫ বছরে এখানে একটা উন্নতি ঘটেছে। গ্রামে মাত্র ৪–৫টি কাঁচা বাড়ি, বাকি সবই পাকা বাড়ি — একতলা বা দোতলা। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে চাষবাসের থেকেই এই উন্নতি। পরিবারের খোরাকির ধান-আলু-সবজির বন্দোবস্ত চাষের থেকেই। তা বাদেও অনেকে ধানের ফসলের কিছু অংশ এবং আলু, পাট, সবজি বিক্রি করে লাভ করেছেন।

গ্রামে সরকারি চাকরি করে (পোস্টঅফিস, স্কুল ও রেলের ওয়ার্কশপে একজন) এমন হাতে গোনা তিন-চারটি পরিবার ছাড়া জমি অধিগ্রহণের ফলে সকলেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারের অল্পবয়সী ছেলেরা বাইরে কাজে যেতে শুরু করেছে কয়েক বছর হল। কলকাতায় যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে চাষের কাজের পাশাপাশি অন্য কাজ করা এতদিন সম্ভব হয়েছে। তবে জমি চলে যাওয়াতে এখন মূলত কাঠের কাজে, ইলেক্ট্রিকের কাজে বাইরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বয়স্ক লোকেরা, যারা যাতায়াত তেমন করতে পারে না, তারা সব থেকে মুশকিলে পড়েছে। গ্রামের ৬০–৬৫ বছর বয়সের মানুষও মাঠে চাষের

কাজ যথেষ্ট লেবার দিয়ে করতে পারে। কিন্তু তাদের পক্ষে অন্য ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়।

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গরু ছিল, মূলত নিজেদের দুধ খাওয়ার জন্য। এক একটা গরু ৫–৬ কেজি থেকে ৮–১০ কেজি দুধ দেয়। নিজেদের খোরাকি বাদে বাকি দুধ ১০ টাকা কেজি দরে বেচে গরু পোষার খরচ অনেকটাই উঠে আসত। এখন কেউ কেউ গরু বেচে দিচ্ছে। বিচালি কোথায় পাওয়া যাবে? গরু চড়াবার জায়গারও অভাব। অধিগৃহীত পাঁচিল ঘেরা জায়গার মধ্যে অধিকাংশেরই নিজস্ব এবং ভাগচাষের জমি পড়ে গেছে। যাদের দু-চার কাঠা জায়গা ঘেরার বাইরে পড়ে আছে তারা অনেকে এবার পাট করেছে, কিছু সবজি হচ্ছে। পাট কাঠি জ্বালানিতে লাগে, যারা পাট করেনি তাদের কাছে বিক্রিও করা হয়। নিজেদের খোরাকিটাই বন্ধ হয়ে গেল এই দুঃখ সবাইকে গ্রাস করেছে।

বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়ার মানুষদের সঙ্গে সমীক্ষার কাজ চালাতে গিয়ে যে মাঠে আমরা বসেছিলাম সেটা ওদের খামারের মাঠ। ওরা জানালো অন্যান্য বছরে এখানে গোলাভরা ধান থাকত, এখন তো দেখলাম, ফাঁকা ময়দান।

এখানে প্রতিদিন মজুর খাটতে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে যেসব লোক আসে তাদের সংখ্যাটা স্বাভাবিকভাবেই কমে গেছে। এমন দুজন মানুষের সাথে কথা হল, ওরা তখন বাড়ি ফেরার পথে। প্রথমজন মহিলা, লক্ষ্মী মণ্ডল, ঝাঁপানডাঙা থেকে আসেন। বললেন :

> *ঝড় হোক জল হোক ৩৬৫দিন আমি এখানে আসি। এখনও রোজ আসি, কাজ হোক আর না-ই হোক। এখানে একজনের বাড়ি আমি ১৬ বছর কাজ করনু। এইরম হতে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এখন পাড়ার যার যা লাগে করি। ... ট্রেন থেকে কয়েকশ লোক এই কামারকুণ্ডু স্টেশনে নেমে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। কিছু লোক আছে যারা ওখানের গেরামে হয়ত কিছুদিন খাটল, আবার অন্য সময় এই দিকেও চলে এল। এখন চারদিকে ধান রোয়ার কাজ চলছে। কোথাও না কোথাও তারা কাজ খুঁজে নিচ্ছে। কেউ কেউ ডানকুনি অবধি চলে যায়, অন্য অন্য স্টেশনেও অনেক লোক নামে। ...*

পাড়ার লোকেরা জানালো, বছরের এই সময়টায় এই পাড়াতেই এক একদিন দু'তিনশ করে লোক ঢুকে পড়ত কাজের খোঁজে। এখন সেখানে অল্প কয়েকজন আসছে। এমনই আর একজন খেতমজুর, নাম কেশব

বালা। আসেন বর্ধমান জেলার চাঁচাই থেকে, মশাগ্রামের পরের স্টেশন। তিনি বললেন :

> *আমার নিজের একটুও জমি নেই, ভাগেও করি না। বরাবরই চাষের কাজে লেবার খাটি। ধান আলুর মরশুমে বর্ধমানের ওদিকে কাজ থাকে, তাই আমি পাটের সিজনেই বেশি আসি এখানে। তবে সবাই তো ধানের কাজ ওদিকে পায় না, তাই ধানকাটার সময় ওদিক থেকে, প্রায় সবসময়ই, লোক আসে। এদিকের লোক কখনো ওদিকে যায় না; এদিকেই তো চাষবাসটা ভালো হয়। এখন তো অনেকটাই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। মানুষের জায়গা জমি সব নিয়ে নিলে আমরা কী করে কাজ পাব? এবছর তো পাট প্রায় হয়নি বললেই চলে। যেসব জমিতে কাজ করেছি তার অনেকটাই ঘেরার মধ্যে পড়ে গেছে।*

বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়ার যে এক ঘর তফসিল জাতির লোক আছে, তারা তিনভাই। তার মধ্যে একজন, সীতারাম মাঝির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনভাই মিলে মোট ৮ বিঘা জমি ভাগে চাষ করতেন। অনথিভুক্ত ভাগচাষী, সীতারাম নিজে চাষ করতেন তিন বিঘার। দু ধরনের ধান (আমন, বোরো), আলু, পাট ছাড়াও সরষে, কুমড়ো, কপি ইত্যাদি কাটা ফসল। এছাড়া সীতারামের একটা 'দমকল' (অর্থাৎ পাম্পসেট) আছে। সেচের কাজে ভাড়া খাটান। ঘন্টায় ৪০–৫০ টাকা ভাড়া, লেবার ইত্যাদি খরচা বাদ দিয়েও ঘন্টায় ২০–২৫ টাকা আয় হত। এটা তাঁর উপরি আয় ছিল। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করেছেন। এবছর পাম্পসেট ভাড়া হচ্ছে না। ফলে ওই আয়টাও বন্ধ। অল্প কিছু জমিতে ঢেঁড়শ করেছেন। কিছুদিন কাজ হবে, তারপর হবে না। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে। বড়োটা ক্লাস নাইনে, ছোটোটা ফাইভে পড়ে। ওদের পড়ার খরচ, আত্মীয়-কুটুম আসা যাওয়া, চিকিৎসা — এতসব খরচ কী করে সামলাবেন ভেবে পাচ্ছেন না। টাটা প্রকল্পের জন্য যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, আগে সেখানে ডিপ টিউবওয়েল ছিল তিনটে, মিনি ছিল ৩৭টা। সেগুলো সব ভেঙে দিয়েছে।ফলে পাঁচিলের বাইরের কিছু জমিতেও সেচের অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া আছে ডিভিসির খাল, কানা নদীর জুলকিয়া খাল। সেচের ব্যবস্থা এত ভালো ছিল বলেই এখানে চাষবাসের এত উন্নতি হতে পেরেছে। আটাত্তরের পর থেকে এখানে কখনও বন্যা হয়নি।

এখন জমি অধিগ্রহণ করে পাঁচিল দেওয়ার ফলে এখানকার স্বাভাবিক

নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে ওরা আশঙ্কা করছে। এতদিন পর্যন্ত বর্ষার নদীতে জলের চাপ বেড়ে গেলে লকগেটের কপাট ফেলে দেওয়া হত। তখন ওপরের বাড়তি জল গোটা জমিতে ছড়িয়ে পড়ত। সেই জলের সাথে সাথে ধান গাছও বেড়ে উঠত। এবার নদীতে জল বেড়ে গেলে কপাট ফেলে দিলে বাড়তি জল এসে নিশ্চয়ই মানুষের ঘরবাড়িতে ঢুকবে।

এছাড়া, প্রকল্পের জন্য ঘেরা জমিতে সারা রাত হ্যালোজেন আলো জ্বলে। পাঁচিলের আশেপাশের যে জমিতে এখন ঢেঁড়শ হচ্ছে ওই হ্যালোজেনের আলো যে জায়গাতে পড়ছে সেখানে ফলন তেমন হচ্ছে না। সাধারণভাবেই ফ্যাক্টরির আশেপাশে চাষের জমি নষ্ট হয়ে যায়, দূষণের ফলে। শুধু গাড়ি কারখানা বলে নয়, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপাশে মহিষটিকরিতে একটা পিচ কারখানা আছে। শীতকালে যখন হাওয়া দেয়, অতদূর থেকে একটু স্পষ্ট গন্ধ ভেসে আসে। এই গ্রামে ওখানকার প্রাইমারি স্কুলের এক শিক্ষক আছেন, তিনি বলেছেন যে ওই গন্ধে বাচ্চাদের খুব শ্বাসকষ্ট হয়, পড়াতেও অসুবিধা হয়।

স্থানীয় লোকেরা আরও বলল, সারা রাত আলো জ্বললে ফসলের এমনিতেও ক্ষতি হয়। কারণ মানুষের যেমন রাতে ঘুম দরকার, গাছেদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া দোবাঁদি বা রুইদাসপাড়ার তুলনায় একটু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানকার মহিলারা সাধারণত কেউই মাঠে চাষের কাজে যায় না। এখানে চাষের কাজ বলতে ধান বয়ে আনা, বাড়ির কাজের প্রয়োজনে একটু-আধটু পাটের বিচুলি নিয়ে আসা। এমনিতে তারা ঘরেই কাজকর্ম করে। তবে চাষের কাজে লেবার লাগলে তাদের জলখাবার দেওয়া, কখনো কাউকে ভাত রেঁধে খাওয়ানো এসব নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকত। এখন জমি চলে যাওয়ায় ছেলেরা যেমন বেকার অবস্থায় কাটাচ্ছে, মেয়েদেরও বেকার-বেকার লাগছে।

অল্পবয়সী মেয়ে-বৌরা কেউ কেউ টিপের কাজ করছে। ঠোঙা বানানোর কাজও কেউ কেউ আগে থেকেই করে। টিপের কাজ বলতে মেয়েদের টিপের ওপর সূক্ষ্ম ডিজাইনের কাজ। এক একটা টিপের পাতায় ১০–১২টা টিপ থাকে। এরকম এক-ডজন টিপের পাতায় কাজ করলে মজুরি ৩ টাকা। ঘরের কাজ সেরে সারা দিনে এর বেশি কেউ পারে না।

এখন গায়ে গতরে খাটনি অনেক কমে গেছে, কিন্তু 'আমাদের মনটাই

ভালো নেই। সব সময় দুশ্চিন্তা' — বললেন পারমিতা দাস নামে এক গৃহবধূ। "আগে যেমন খাটনি ছিল, এখানে ওখানে অনুষ্ঠান ছিল, মনে একটা স্ফূর্তি ছিল। এখন একদম ভালো লাগে না। আগে আমাদের ঘরে ধান ছিল। ধান সেদ্ধ করা, মুড়ি ভাজা — এসব কাজ আমরা নিজেরাই করতাম। তাতে কোন কষ্ট নেই। কাজ করলে শরীর ভালো থাকে। আর এখন একটা চাপ, একটা দুশ্চিন্তা আমাদের দুর্বল করে দিচ্ছে।"

যে ক্ষতির পূরণ নেই

সিঙ্গুরে যে পাঁচটি মৌজা — গোপালনগর, বেড়াবেড়ি, বাজেমেলিয়া, সিংহেরভেড়ি ও খাসেরভেড়ি — টাটার কারখানার জন্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের দখলে চলে গেছে, সরকারি প্রতিবেদন (Status Report on Singur, Govt. of West Bengal, 31 December 2006) থেকে জানা যাচ্ছে : এই পাঁচটি মৌজায় মোট **৩৫৯৫.৪৭** একর জমির **৯৯৭.১১** একর অধিগৃহিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, পরিবার এবং গ্রাম কিন্তু এই **৯৯৭.১১** একর ঘিরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। লাগোয়া গ্রামগুলিতে একভাবে এই ক্ষতি টের পাওয়া যায়। ক্ষতিগ্রস্ত কেবল জমির মালিকেরাই নয়, বরং এই জমির সঙ্গে নানান মাত্রায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ ছিল, এমন বহু মানুষেরই বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতি হয়েছে, হয়ে চলেছে। ক্ষতি মানুষ সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে, পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, পুষিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে সরকারি পক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে। কিন্তু সমস্ত ক্ষতির কি পূরণ সম্ভব?

এই মর্মে প্রথমেই আমরা সরকারি তথ্য থেকে দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র সিঙ্গুরে চাষী অর্থাৎ চাষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত মানুষের ৭৮% প্রান্তিক চাষী অথবা ভূমিহীন খেতমজুর।

সারণী ১ : সিঙ্গুরে কৃষিজীবী জনসংখ্যার গঠন

	বর্গাদার	পাট্টাদার	ছোটো চাষী	প্রান্তিক চাষী	খেতমজুর
জনসংখ্যা	২৯৬৯	১০৩৫	৩৫০০	১২,৪১০	১৫,৫৮৪
শতাংশ	৮.৩৬	২.৯১	৯.৮৬	৩৪.৯৬	৪৩.৯

*সূত্র :**Statistical Handbook of West Bengal , 2004 (Table 17.2)***

এই সারণীতে ছোটো চাষী বলতে যার জমির পরিমাণ **১–২** হেক্টরের মধ্যে, এবং প্রান্তিক চাষী সর্বোচ্চ এক হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক। এতে অনথিভুক্ত ভাগচাষীদের কোনও সংখ্যার উল্লেখ নেই। কিন্তু আজ একথা সকলেই জানে যে সিঙ্গুরে অনথিভুক্ত ভাগচাষীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিতি রয়েছে, যারা বহু বছর ধরে বা বংশানুক্রমে কোন নির্দিষ্ট মালিকের জমি চাষ করে এসেছে। যত্ন নিয়ে চেষ্টা করলে গ্রাম ভিত্তিতে তাদের তালিকা তৈরি করা সম্ভব। সংবিধানের অধিকার অনুযায়ী পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামসভা বা গ্রাম সংসদ এই তালিকা প্রস্তুত করতে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু পঞ্চায়েতগুলি, যে দলেরই প্রভাবাধীন থাকুক না কেন, এই কাজে হাত লাগায়নি।[†] অন্যদিকে, যেসব অনথিভুক্ত ভাগচাষীরা অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন মালিকের জমিতে চাষ করে এসেছে, তাদের তালিকা প্রস্তুত করার কাজ বেশ কঠিন। কিন্তু এটা সহজেই আন্দাজ করা যায়, সিঙ্গুরে এই ৭৮% প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন খেতমজুরদের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে এইসব অনথিভুক্ত ভাগচাষীদের বেশিরভাগ অংশ।

অনুমান করা যেতে পারে, সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের এলাকাগুলিতেও ওই একই অনুপাতে অর্থাৎ ৭৮% ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ হল প্রান্তিক চাষী এবং খেতমজুর। এই প্রান্তিক চাষীদের হাতে সরকারি হিসেব মতো ১ হেক্টর অর্থাৎ ২.৪৭ একর বা ৮.১৫ বিঘার কম জমি রয়েছে। সিঙ্গুর চাষের দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সুবাদে, এই প্রান্তিকদের ওপরের স্তরে বেশ কিছু চাষী পরিবারের অবস্থা কিছুটা ভাল। সেই অংশটুকু বাদ দিলে দেখা যাবে বাকিটা, অর্থাৎ যারা মোট চাষীদের (খেতমজুর সহ) ৫০ শতাংশের অনেক বেশি, তারা গরিব। তাদের অবস্থা এমনই যে অধিগ্রহণের ধাক্কা সামলানো তাদের পক্ষে মুশকিল। এদের মধ্যে যারা নথিভুক্ত ভাগচাষী এবং সামান্য জমির মালিক, তারা হয়ত টাকার অঙ্কে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে বা বর্তমান আইনের নিরিখে পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু

[†] সিপিআইএম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পুস্তিকা 'প্রসঙ্গ সিঙ্গুর ও শিল্পায়ন'-এ অধিগৃহীত পাঁচটি মৌজায় অনথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা উল্লেখ করা ছিল ১৭০ জন। এ তথ্য ছিল ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত। ১০ আগস্ট ২০০৭ আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে হুগলির জেলাশাসক সূত্রে জানা যায়, সিঙ্গুরে অনথিভুক্ত বর্গাদারদের শুনানির শেষে সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ৩১২। কিন্তু এই তালিকা কতখানি সম্পূর্ণ, তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেশ কম।

অর্থাৎ, বিপরীত দিক থেকে দেখলে বলা যায়, সরকারি তথ্য অনুযায়ী ওপরের দিকের মাত্র ২২ শতাংশ চাষী ভালো ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে অথবা বর্তমান আইনের নিরিখে করবার যোগ্য। এদের মধ্যে নিশ্চয় জমি দিতে অনিচ্ছুক চাষীরাও রয়েছে। কিন্তু সেই ওপরের স্তরটুকু বাদ দিলে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এক বিপুল অংশের চাষী (খেতমজুররাও এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ, ৪৩.৯ শতাংশ) যে ক্ষতির কবলে পড়ছে, তার সরকারি সমাধানে কোনও পূরণ নেই। কিন্তু সরকারের তরফে প্রচার আছে, সিঙ্গুরে যা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তা সারা দেশে বিরল। টাকার অঙ্কের বিচারে তার মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। শতাধিক বৎসরের পুরনো ইংরেজের জমি অধিগ্রহণ আইনে বা ভারতীয় সংবিধানের কোথাও-ই এই ধরনের ক্ষতিপূরণের চেয়ে ভিন্ন কোনও কথা বলা নেই। মজার কথা, পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় বিরোধীরাও 'অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরৎ দিতে হবে' — এর বাইরে আর কিছু বলতে পারছে না। অর্থাৎ সংসদীয়, আইনি এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাধান প্রক্রিয়ায় এই ক্ষতির কোনও পূরণ আপাতত দৃশ্যমান হচ্ছে না। এবারে আমরা আসি, সরকারি হিসেবের বাইরে, বাস্তব জীবনের চিত্র থেকে পাওয়া ক্ষতির হিসেবনিকেশে।

বাস্তব চিত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে, জুলকিয়া খালের ওপারে জয়মোল্লার মুসলমান পাড়া, ধাড়াপাড়া থেকে শুরু করে এপারের পাগড়েপাড়ার

> "একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হল 'জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪', যা জমিহারাদের, বিশেষত জমির সঙ্গে যাদের জীবিকা যুক্ত সেই ছোটো চাষী এবং অন্যান্যদের অধিকার রক্ষা করতে খুবই অপ্রতুল। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবে আলোচনা করার প্রশ্নের, যার সঙ্গে তাদের সম্মতির প্রশ্নটি যুক্ত, বর্তমানে কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে ভাগচাষীরা নথিভুক্ত নয়। বর্তমান আইনে এদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। খেতমজুরদের জন্য এতে কোনও ব্যবস্থা নেই। যদিও এক্ষেত্রে সিঙ্গুরের গাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিপূরণের প্যাকেজে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করার বামফ্রন্টের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। ..."
>
> *Change The Special Economic Zone Act, 2005, CPI(M), April 2007*

বাগদিদের মধ্যে, সাঁতরাপাড়ার মাহিষ্যদের মধ্যে, রুইদাসপাড়ার রুইদাস বা চর্মকারদের মধ্যে, মধ্যপাড়ার বাগদিদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় ভূমিহীন মানুষ রয়েছে, যাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রত্যক্ষভাবে চাষের কাজ না করলেও নানাভাবে এই জমির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এছাড়া, বাজেমেলিয়া, বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া, গোপালনগর, মধ্যপাড়া, সাওপাড়া, সাহানাপাড়ায় এবং খাসেরভেড়িতেও কিছু কিছু খেতমজুর পরিবার রয়েছে, যারাও এই জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত। আর দোবাঁদির মতো গ্রাম, যেখানে প্রত্যেক ঘরের মহিলারা পর্যন্ত চাষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল, তাদের ক্ষতি তো মাত্রাছাড়া।

এরা সকলেই জনগণনা এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। নাগরিক পরিচয়ের সমস্ত নথিই এদের এবং সরকারের জিম্মায় রয়েছে। অথচ গত দেড় বছর ধরে এদের কোন গ্রামভিত্তিক তালিকা তৈরি করা অথবা তাদের মত-অমতকে গুরুত্ব দেওয়ার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ সরকারি বা আন্দোলনকারী কোনও পক্ষের তরফেই দেখা যায়নি। অধিগ্রহণের অভিশাপ ও দুর্গতি এদের পরিবারগুলিতে নেমে এসেছে নীরবে নিঃশব্দে, সমস্ত সরকারি বেসরকারি পক্ষ-বিপক্ষ প্রচারধারার অন্তরালে।

এছাড়া, সিঙ্গুরে চাষের মরসুমে প্রতিদিন বাইরে থেকে মাঠে খাটতে আসে হাজার হাজার মানুষ। ভোরবেলা থেকে কামারকুণ্ডু বা মধুসূদনপুর স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এদের দেখা যেত। ট্রেন থেকে নেমে তারা দলে দলে মাঠে চলে আসত। সিঙ্গুরে এখন এদের অধিকাংশেরই আসা বন্ধ। এরা আসত ধনেখালি, মাঝেরগ্রাম, হাজিগড়, বর্ধমান, মশাগ্রাম, ঝাপানডাঙা, দশঘড়া থেকে। পুরুষ-মহিলা উভয়েই। ধান কাটার সময় এরা মাঠে 'কিষেণ'-এর কাজ করত। ধান রোয়ার সময় আসত বাইরের মেয়েরা। মাহিষ্যপাড়ায় বিশেষ সময়ে এরা ঘর বেঁধে থেকেও যেত কিছুদিন। যেমন আসত রাঁচী থেকে, ফি'বছর কয়েক'শ লোক। জাতে এরা ধাঙ্গর, মাঠ থেকে বাঁকে ফসল বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তাদের লাগত। দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকেরাও মাঠের কাজে এসে কিছুদিন থেকে যেত। এই সব বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন পেশা-কাজের ও বিভিন্ন দক্ষতার মানুষও সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের ফলে কাজ হারিয়েছে।

ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ মুখ্য প্রশ্ন নয়

অনেক সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিপিআইএমের বক্তব্যে এবং বড়ো মিডিয়ার সংবাদে বলা হয়েছে, সিঙ্গুরে জমির মালিকদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তা সারা ভারতে নজিরবিহীন। আবার, এমন বক্তব্যও কোন সমীক্ষা থেকে বেরিয়ে এসেছে, সিঙ্গুরের চাষীদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্কের পরিমাণ। ২০০৬ সাল থেকে এপর্যন্ত বেশ কিছু সমীক্ষা সিঙ্গুরে চালানো হয়েছে। প্রায় সকলেই সিঙ্গুরের জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণে বিক্ষোভের পরিমাপ এবং বিক্ষোভের কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সমীক্ষাগুলি থেকে, তবে আমাদের এখনকার সমীক্ষা সহ কোনটিকেই সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক বলা চলে না, প্রতিটি সমীক্ষাই কমবেশি আংশিক। আমাদের সমীক্ষায় সর্বোপরি এটাই ধরা পড়েছে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে সন্তোষ বা অসন্তোষ, কোনটাই এখানে মুখ্য প্রশ্ন নয়।

সবচেয়ে অবস্থাপন্ন, সাহা, বারুই বা ঘোষেদের মধ্যে যাদের জমির পরিমাণ বেশি, যারা অনুপস্থিত জমির মালিক (absentee landlord) অথবা যারা নিজেরা জমি চাষ করে না, নথিভুক্ত বা অনথিভুক্ত বর্গা/ভাগচাষীকে দিয়ে জমি চাষ করায়, তারা ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট হতেই পারে। সাহারা অনেকে বন্ধকি কারবার করে, বারুইদের নানারকম চালু ব্যবসা রয়েছে আর ঘোষেদের মধ্যে ছানা ও দুধের কারবার রয়েছে। ক্যাশ টাকাটা তাদের আরও উন্নতির কাজে লাগতে পারে। যেমন, ধরা যাক, হিমাংশু বারুইয়ের কথা। পরিবারের বিভিন্ন নামে মোট ৭৫ বিঘা জমি তাঁদের রয়েছে। কত ক্ষতিপূরণ তাঁরা পেয়েছেন? কমপক্ষে, শালি জমি ধরলেও ওই জমির ক্ষতিপূরণ হয় ২ কোটি ১৪.৫ লক্ষ টাকা। সেই টাকাটা যদি ব্যাঙ্কে ১০ বছরের জন্য ফিক্সড করে জমা রাখা হয়, তাহলে বছরে আসে সুদ বাবদ প্রায় ১৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। আর ওই জমি ভাগে দিলে ২৫ শতাংশ ভাগ বাবদ তাঁদের আয় হতে পারে বছরে আনুমানিক ৪.৫ লক্ষ টাকা[‡]। সেদিক থেকে টাটার কারখানার জন্য জমি দিয়ে এই

[‡] এখানে বছরের একটা মরসুমে আমন আর আলু চাষ ধরে হিসেব করা হয়েছে।

ধরনের লোকেদের লাভই বটে। কিন্তু সিঙ্গুরে এরা কতজন? জনসংখ্যা বিন্যাসের সরকারি হিসেব ধরে অনুমান করা যায়, এরা সব মিলিয়ে ৫ শতাংশের কম। তার সঙ্গে হয়তো যোগ হবে আরো কিছু করিৎকর্মা লোকের সংখ্যা, যারা এখন থেকেই ইঁট–বালি সাপ্লাই দিয়ে টাটা বা শিল্প নিগমের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে শুরু করেছে।

এদের থেকে কম অবস্থাপন্ন অথচ সংখ্যায় অনেক বেশি, দু'দশ বিঘে জমির মালিক, কিন্তু চাষে উন্নতি হচ্ছিল, দাস, মান্না প্রভৃতিদের মধ্যে এরকম বহু পরিবার রয়েছে। এই সূত্রে আমরা অন্য সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করব। এই সমীক্ষকেরা তিনটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়েছিল, গতবছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে : বাজেমেলিয়া, বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া ও খাসের ভেড়ি। ওই সমীক্ষায় ওই তিনটি গ্রামের পরিবারগত জমির মালিকানার ধরন যেরকম হিসেব করা হয়েছে :

সারণী ২ : পরিবারগত জমির মালিকানার ধরন

গ্রাম	ভূমিহীন	অতি–প্রান্তিক চাষী	প্রান্তিক চাষী	ছোটো চাষী	মধ্য চাষী	বড়ো চাষী
বাজেমেলিয়া	৫০	৭৫০	১৩০	২০	০	০
বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া	২০	১৪০	২০	২২	০	০
খাসের ভেড়ি	৫০	৯০	১৫	১০	০	০
মোট	১২০	৯৮০	১৬৫	৫২	০	০

সূত্র : Understanding the Dynamics and Impact of Land Acquisition in Selected Areas of West Bengal, Actionaid India , 2006.

এই সারণী থেকে কী দেখা যাচ্ছে? ওই তিনটি গ্রামে, প্রথমত, ১২০টি ভূমিহীন পরিবার কোনও ক্ষতিপূরণ পায়নি, বর্তমান আইনের নিরিখে পাওয়ার যোগ্যও নয়। আর ৯৮০টি পরিবার অতি–প্রান্তিক, অর্থাৎ তাদের জমির পরিমাণ ছিল সমীক্ষকদের হিসাব অনুযায়ী ০.৫ হেক্টর (৪.০৮ বিঘা) বা তারও কম। এত কম জমি থাকা সত্ত্বেও এরা লাভজনকভাবেই নিজেরা চাষ করে এসেছে। কিভাবে? সেটা বুঝতে গেলে প্রান্তিক ও অতি প্রান্তিক চাষী পরিবারের চাষের চালচিত্র, বাস্তব অর্থনৈতিক স্থিতি এবং উন্নতির দিক থেকে বিষয়টি দেখা প্রয়োজন। বোঝার চেষ্টা করা যাবে এ প্রশ্নটিকেও,

ছোটো চাষী কেন সিঙ্গুরে জমি না-দেওয়ার আন্দোলনের পুরোভাগে।

সারণী ৩

বর্তমান সমীক্ষায় প্রাপ্ত ১ বিঘে জমিতে আমন ধান চাষে খরচের হিসেব

মজুর : কাজের ধরন এবং খরচ

বীজধান বপন (১টা @ ৫০ টাকা) ৫০ টাকা

ধান রোয়া (৯টা @ ৫০ টাকা) ৪৫০ টাকা

জমি নিড়ানো (৫টা @ ৫০ টাকা) ২৫০ টাকা

ধান কাটা (৫টা @ ৫০ টাকা) ২৫০ টাকা

ধান তোলা (৪টা @ ৫০ টাকা) ২০০ টাকা

ধান ঝাড়া (৪টা @ ৫০ টাকা) ২০০ টাকা

ওষুধ দেওয়া (৩ বার, ২ টা @ ৫০ টাকা) ৩০০ টাকা

সার দেওয়া (২টা @ ৫০ টাকা) ১০০ টাকা

জমি দেখভাল করা (৫টা @ ৫০ টাকা) ২৫০ টাকা

সার (৩৫ কেজি @ ১০ টাকা) ৩৫০ টাকা

ট্রাক্টর ৪০০ টাকা

ইউরিয়া (১০ কেজি @ ৬.৫০ টাকা) ৬৫ টাকা

ওষুধ ৩০০ টাকা

(বীজ-ধান সাধারণত ঘরে তৈরি করে নেওয়া হয়।)

মোট ~ ৩১৫০ টাকা, যার মধ্যে ২০৫০ টাকা, অর্থাৎ ৬৫% মজুর বাবদ।

এই হিসেব, যে চাষীবাড়িতে মাঠে খাটার লোক নেই, তাদের। চাষীবাড়িতে মাঠে খাটার লোক ক'টি এবং চাষীবাড়ির মোট জমি কত, তার ওপর এই মজুর বাবদ খরচ অনেকটা নির্ভর করে। যদি চাষীবাড়িতে ১ জন লোক মাঠে কাজ করে, তবে মজুর খরচা বড়ো একটা কমবে না, কেবল দেখভালের মজুর খরচ বাদ যাবে। একাধিক হলে? নীচের তালিকা দেখুন।

বাড়ির মোট জমি	বাড়িতে মাঠে খাটার লোক	মোট মজুর খরচ
১ একর	২ জন	শূন্য
২ একর	২ জন	এক তৃতীয়াংশ
২ একর	৩ জন	শূন্য
৩ একর	৩ জন	এক তৃতীয়াংশ
৩ একর	৪ জন	শূন্য

ওপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমন চাষে প্রধান খরচ মজুর (ধানের বীজ বাদে মোট খরচের ৬৫%)। চাষীবাড়িতে যদি মাঠে খাটার লোক থাকে, তাহলে এই সবক'টি শ্রম প্রক্রিয়াতে মজুর কম লাগবে। কারণ সবক'টি শ্রম প্রক্রিয়া আলাদা আলাদা সময়ে হয়। ফলত, মজুরের খরচ কমে যাবে। বাড়ির মাঠে খাটার লোক-পিছু কিভাবে এই মজুর খরচ কমবে, তা সারণীতে দেওয়া হল। এটাই চাষীবাড়ির উপরি লাভ। এমনিতে গোটাটাই লোক দিয়ে করালে দাম মোটামুটি ভালো পেলে আমন চাষে ৩২০০ টাকা লাগিয়ে বিঘেতে ১০০০ টাকার মতো লাভ থাকে (বিঘেতে ৬ কুইন্টাল ধান, ৭০০ টাকা কুইন্টাল)। বাড়ির লোক মাঠে খাটার ফলে মজুর খরচ কমে যাবার দরুণ তা হয়ে যেতে পারে বিঘে প্রতি ১২০০ টাকা লাগিয়ে ৩০০০ টাকার মতো। প্রসঙ্গত, আমন ধানে জলের খরচ নেই। বর্ষার জলে চাষ হয়। বোরো ধানের ক্ষেত্রে চাষের খরচ বেশি, সার বেশি লাগে, জল লাগে। মজুরও লাগে বেশি। পক্ষান্তরে বোরো ধানে ফলনও বেশি। প্রায় দেড়গুণ। কিন্তু আমনের এই মজুর-ভিত্তিক হিসেব কমবেশি বোরো ধান, আলু, পাট, সর্ষে, শাক সবজি সব কিছুতেই একই রকম। বরং মজুর-ভিত্তি অন্যান্য চাষে একটু বেশিই। যাই হোক, চাষী এই লাভের মধ্যে দিয়ে, তার জীবনযাপনে ভোগ্য সামগ্রীর প্রাধান্য বিস্তার না করতে দিয়ে, এই টাকাটির অনেকটা জমাতে পারে। কারণ চাষী মাঠের ফসল থেকে (বহুফসলি জমিতে) তার বৎসরের খোরাকির চাল, আলু, আনাজ, তেল জমিয়ে বাকিটা বিক্রি করে। ওই জমানো টাকাটি দিয়ে সে আবার নতুন করে জমি কেনার কথা ভাবতেও পারে। কোন জমি? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত চাষীর জমি। যে চাষী নিজে মাঠে চাষ করে না, গোটাটাই লোক দিয়ে করায়, তার চাষে প্রায় কোনও লাভ নেই। তার জমি বিক্রি হয়ে যায়। এবং বিক্রি হয় অনুপস্থিত চাষীর জমি। কেনে কারা? এই মাঠে কাজ করা চাষীরা। অনেক সময় দেখা যায়, অল্প জমির মালিক এই চাষী পরিবারগুলি ওই অনুপস্থিত চাষীর জমিতে অল্প অল্প করে ভাগে করছে বেশ কয়েক বছর ধরে। কিন্তু বর্গা রেকর্ড করা হচ্ছে না, বদলে কয়েক বছর পর সে ওই জমি কিনে নিচ্ছে। কিন্তু এই নতুন জমি কেনার একটা সীমা আছে। দেখা যায়, পরিবারে কর্মঠ পুরুষ মানুষ পিছু ৫ বিঘার বেশি জমি থাকলে ওই বাড়তি জমিতে পুরোটাই লোক লাগিয়ে চাষ করতে

হচ্ছে। তাই সেখানে আর লাভ নেই। তাই চাষী হিসেব করে এগোয়। ছেলে পিছু ৫ বিঘা করে জমি কেনার লক্ষ্যমাত্রা থাকে। আর মেয়ে হলে তার বিয়ে বাবদ ২-১ বিঘা জমি বেচতেই হবে। এই হিসেব আদর্শ ক্ষেত্রে পুরোটা মেলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ত কিছুটা মেলে। কিন্তু এই হিসেবের মধ্যে চাষভিত্তিক ভবিষ্যৎ প্রকল্পের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইভাবে চাষের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নতির প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রায় বছর ২৫-৩০ ধরে চলছে। পুরোটাই সম্ভব হয়েছে এই পর্যায়ে সেচ, সার ও ট্রাক্টর প্রভৃতির মাধ্যমে চাষে আধুনিকীকরণের কারণে। আর এইসব পরিবারে যদি কেউ একটা ছোটোখাটো চাকরি জোগাড় করে ফেলতে পারে, তবে সেটা পরিবারের চাষ নামক শিল্পে পুঁজি হিসেবে কাজ করে। আর ধারে জল কিনতে হয় না বা সার কিনতে হয় না। আরও জমি কেনার জন্য টাকা সঞ্চয়ও করা যায়। নিড়ানটা বা ওষুধটা দুবারের বদলে তিনবার দেওয়া যায়। যাতে ফলন বাড়ে বা ভালো হয়। ফসলটাও ধারের শর্তের কারণে তাড়াহুড়ো করে কম দামে বিক্রি করে দিতে হয় না, ভালো দাম পাওয়ার জন্য কিছুদিন মজুত করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। তাই ওই ছোটো চাকরি কখনও পুরো পরিবারটিকে চাষ ত্যাগ করে চাকরিজীবী হয়ে উঠতে উৎসাহ যোগায় না। বরং তা চাষে উৎসাহ সঞ্চার করে। সিঙ্গুরে ছোটো চাষীর জমি আঁকড়ে থাকতে চাওয়ার মূলে রয়েছে এই নিজস্ব, স্বচ্ছ ভবিষ্যতের কল্পনা। বলা বাহুল্য এই প্রকল্প কোন সরকারি পরিকল্পনার অঙ্গ নয়, মানুষের তৈরি। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল বেড়াবেড়ি পুর্বপাড়ার পুরঞ্জয় দাসের কথায়, "আজ থেকে ২০ বছর আগে এখানে এলে দেখতেন, সব মাটির বাড়ি, আজ মাটির বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সব চাষ থেকে।" ক্ষতিপূরণের টাকা এবং এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংসারিক দিক — এই দুটি তুলনাতেই আসে না।

প্রসঙ্গত, সংযোজনী ৬ (পৃষ্ঠা ৩৫) থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, মোট ৭৮৯ জন, যারা আদালতে হলফনামা পেশ করে জমি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের মধ্যে ৭৩০ জনের ১ একর বা তারও কম জমি সরকারের হাতে চলে গেছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০০ জনের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ ০.২ একর বা তারও কম। অনুমান করা যায়, এরা ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে মোটেই উৎসাহী নয়। তাদের ক্ষতিকে টাকা দিয়ে

বা তাদের জমির সামান্য পরিমাণ দিয়ে আন্দাজ করা যায় না, পূরণ করা তো অসম্ভব।

সারণী ৪

মৌজা	মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একর)	অসম্মত চাষীদের জমির পরিমাণ (একর)
গোপালনগর	১৬৫৬.৫৫	৩৯৯.৯৮	১৬৫.১২
বেড়াবেড়ি	১০৪৩.৮২	৩২৭.২১	৯২.৯২
খাসের ভেড়ি	২২৯.৬২	১৮০.৫৯	৫২.৬৭
বাজেমেলিয়া	৩৫৫.১৩	৪৭.৭৭	২২.৬৪
সিংহের ভেড়ি	৩১০.৭৫	৪১.৫৬	৪.৬২
মোট	**৩৫৯৫.৮৭**	**৯৯৭.১১**	**৩৩৭.৯৭**

সূত্র : উৎস মানুষ পত্রিকা , বিশেষ ক্রোড়পত্র , জুলাই ২০০৭।

এদের নীচে রয়েছে জমির মালিকানা না-থাকা ভূমিহীন বিপুল জনসমষ্টি। সিঙ্গুরে এরা মোট কৃষিজীবী জনসংখ্যার ৪৩.৯ শতাংশ। যদিও এই ভূমিহীনেরা সকলেই অধিগৃহীত ৯৯৭.১১ একরে চাষের কাজে যুক্ত ছিল না। যেমন, মধ্যপাড়ার বাগদিরা, রুইদাসপাড়ার ভ্যানচালক, কাঠের মিস্ত্রি বা অন্য পেশার লোকজন। কিন্তু বেশিরভাগ স্থানীয় ভূমিহীন ওই জমিতে কাজ করত। যেমন, দোবাঁদির বাউরি মহিলা ও পুরুষেরা, গোপালনগরের সাওপাড়া, সাহানাপাড়ার লোকেরা, রুইদাসপাড়ার পুরুষদেরও একটা অংশ ওই জমিতে খেতমজুরি বা ভাগে/ঠিকায় চাষ করে এসেছে। এদের মধ্যে যাদের মুখ্য পেশা খেতমজুরি, ভাগে চাষ, বা জমির কোনও কাজ নয় — তারা ক্ষতিপূরণ না পেলেও — টাটার কারখানা হলে কাজ হবে, এই আশ্বাসে তারা কেউ কেউ কিছুটা ভরসা করেছে। টাটার কারখানা স্থাপনের আনুষঙ্গিক কাজেও তাদের একটা অংশ যাচ্ছে। কিন্তু যারা মূলত চাষের ওপরই নির্ভরশীল, তাদের কাছে জমি অধিগ্রহণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্য নয় ঘেরা জমির রাতপাহারা, মাটি বওয়া বা সেলাইয়ের ট্রেনিংয়ের মতো কাজগুলি।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওপরের স্তরের বেশ অবস্থাপন্ন এবং মূলত অন্য পেশা বা কাজের ওপর নির্ভরশীল কয়েক শতাংশ লোক বাদ দিলে, সিঙ্গুরের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবার তথা

জনসংখ্যা ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক নিয়ে মোটেই বিক্ষুব্ধ নয়, তাদের বিক্ষোভের কেন্দ্রীয় বিষয় চাষ হারানো। তাই আমাদের এই সমীক্ষার শিরোনাম : যে ক্ষতির পূরণ নেই।

জমি অধিগ্রহণ : যাদের পক্ষে ধ্বংসাত্মক

অন্যদিক থেকেও আরও ভয়াবহ ও গভীরতর মাত্রায় পূরণের অযোগ্য ক্ষতির প্রশ্নটি আসছে। সেই প্রশ্নটি ছুঁতে গেলে আমাদের দোবাঁদির দিক থেকে অবস্থার বিচার করা দরকার।

দোবাঁদির মানুষ চাষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সূত্রে এখানে এসে বাসা বেঁধেছিল কয়েক পুরুষ আগে। সত্যি বলতে কি, তাদের অভাব-অনটন কোনদিনই দূর হয়নি। কিন্তু সিঙ্গুর চাষে-ফসলে-দুধে বা আনুষঙ্গিক ব্যবসায় সমৃদ্ধ হয়েছে। মাঠে জনমজুরি করার সূত্রে চাষীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা বহুদিনের। জনমজুরি করতে করতে তারা ক্রমশ ভাগে চাষ শুরু করেছে, এক-একটা মরসুম-ভিত্তিক ফসল অনুযায়ী টুকরো-টুকরো জমি ভাগে নিয়ে ফসল ফলিয়েছে। সিজনের ধান আমন চাষ না পেলেও অফ-সিজনের ধান বোরো এবং আলু, পাট, সবজি তারা ভাগে চাষ করে ফলিয়েছে। ওতেই তাদের সামান্য যা-কিছু উন্নতির উৎসাহ। কিন্তু কখনও নির্দিষ্ট মালিকের জমি স্থিরভাবে বছরের পর বছর ভাগে পায়নি। ফলত, দু'একটি পরিবার বাদে, তাদের বর্গা রেকর্ড হয়নি।

এখানে দোবাঁদি এবং রুইদাসপাড়া : দুটি আলাদা চিত্র। দুটিই ভূমিহীনদের গ্রাম। দোবাঁদি চাষের ওপর সরাসরি ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। রুইদাসপাড়া চাষের ওপর সরাসরি অতটা নির্ভরশীল নয়। এখানে বাউরি ও চর্মকারদের আলাদা জাতগত ও সামাজিক ঐতিহ্যের দিকটিরও ভূমিকা রয়েছে। চাষের ওপর এতটা নির্ভরশীলতাই দোবাঁদিকে জমি না-দেওয়ার আন্দোলনে এতখানি যুক্ত করেছে। চাষের ওপর নির্ভরশীলতা কম থাকায় এবং অন্য পেশার অভ্যাস থাকায় রুইদাসপাড়া টাটা এবং সরকারের প্রতিশ্রুতিতে কিছুটা ভরসা করতে চাইছে। দুটি গ্রামের রাজনৈতিক সমর্থনের ঝোঁকও এই বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে খাপ খায়।

দোবাঁদির মহিলা ও পুরুষেরা এখন দেখছে, টাটার জন্য জমি অধিগ্রহণ হয়ে যাওয়ায় বাস্তুটা তাদের রয়েছে আর সামনের এতদিন চষা জমিটা

উধাও। এই অবস্থাটা তাদের কাছে শ্বাসরোধকারী, মৃত্যুর শামিল।

সমাজ নিশ্চল নয়, সমাজের ভিতর থেকে রূপান্তর বা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে, পুরনো পেশা-কাজ বা তার পদ্ধতি-প্রযুক্তিরও বদল হতে পারে। দোবাঁদিতে আমরা দেখেছি, খেতমজুর মহিলা সনকা পাত্রের বাচ্চা মেয়েরা শাড়ির ওপর এমব্রয়ডারির কাজ শুরু করেছে। শাড়ি প্রতি ৫০ টাকা আয়। কিংবা মধ্যপাড়ায় দেখেছি, গলার হারের লকেটে পুঁতি বসানোর কাজ করতে শুরু করেছে জনা চারেক কিশোর। চাষের কাজে বেকার হয়ে গিয়ে কেউ হয়ত কারখানার দারোয়ানের কাজে যাচ্ছে, কেউ হয়ত অন্য রাজ্যেও পা বাড়াচ্ছে। কিন্তু সমাজের বাইরে থেকে যদি আচমকা ধাক্কাটা আসে, একটা আগ্রাসনের মতো, গ্রামসমাজে এই যে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সৃষ্টি হয়, এক-একটা পরিবার ছারখার হয়ে যায়, ভেঙে যায়, তবে তা কেমন বদল?

দোবাঁদির ভ্যানচালক বিলু মৈত্রীর কন্ঠস্বরে সেই আর্তি প্রকাশ পায় :

অনেক ভ্যানচালক ছিল, আট-দশটা। একটা গ্রুপ ছিলাম। খানতিনেক আছে, বাদবাকি সব বিক্রি হয়ে গেছে। মাঠে আর কোন কাজ নেই। ওই প্যান্ডেলের দোকানরা কাজ দেয় ওদের, যে ক'টা ভ্যান আছে। যেদিন হয়, সেদিন।

যেটার ওপর আমরা করে খাচ্ছিলাম সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে। আর কিচ্ছু করার নেই। একবছরের বেশি বন্ধ হয়ে গেল। ... চলছে বন্ধক দিয়ে। পাঁচটা গরু ছিল, বিক্রি হয়ে ... এখন একটা গরু আছে। ...

আজকে এখন [বেলা তিনটে] রান্না হচ্ছে, আলু-ভাত। দেখুন। এরকম কষ্ট কোনদিন হয় না।

এখন পার্টিতে পার্টিতে যে আলোচনা চলছে, তাতে আমাদের কথাটা নেই। ... না খেতে পেলে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি, এখান-সেখান, যারা টাকা নিয়ে ফিরবে তাদের ...

যে প্রত্যক্ষ গায়ে-গতরে-চাষীদের সঙ্গে একসাথে তারা ওই মাঠে এতদিন চাষ করে এসেছে, তাদেরই সঙ্গে তারা জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছে। টাটার পাঁচিল উঠে যাওয়ার পরও তারা বেকার হয়ে অভাব সহ্য করেছে। ঘরে হাঁড়ি চড়েনি, কিন্তু মাথা হেঁট করে টাটার প্রজেক্টের কাজে তারা যায়নি। প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত আন্দোলনের অন্যতম শক্তি হওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলনে তাদের কোনও প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখতে পাইনি। সিঙ্গুর আন্দোলনের সংগঠনেও তারা নেতৃত্বের

অংশ নয়। আন্দোলন যখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, আমরা শুনেছি, বাউরিপাড়ার ছেলেরা হাতে লাঠি তুলে নিয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্বের নির্দেশে তারা হাতের লাঠি ফেলে দিয়েছে। এখনও কথা বলতে বলতে মহিলারা এমনও বলে ফেলেন : 'আমরা ওদের জন্য লড়েছি'। 'ওদের' বলতে সেই চাষীদের জন্য, যে চাষীরা জমি দিতে চায়নি, আজও হয়ত তারা অনেকে সরকারের হাত থেকে ক্ষতিপূরণ নেয়নি। এই চাষীদের সঙ্গেই তারা লেপ্টে থাকতে চেয়েছে, আলাদা প্রতিনিধিত্ব চায়নি, আলাদা দাবি করেনি, আলাদা সংগঠনও গড়েনি।

স্থানীয় খেতমজুর যুবকদের মন্তব্য

"নেতৃত্ব গণআন্দোলনের থেকে সরে গেল। রাজনীতি এসে গেল। আন্দোলনটা পার্টিগত দাঁড়িয়ে গেল।"

"আমাদের কোনও গাইড নেই।"

"আমাদের পিছনে ওদের মতো কোনও বুদ্ধিজীবী নেই।"

কিন্তু ক্ষতির দিক থেকে তাদের অবস্থাটা তো আলাদা। সংখ্যার দিক থেকেও তারা যথেষ্ট ভারি — কী জনগণনায়, কী ভোটার তালিকায়, কী মাঠের কাজে, সর্বত্র। চাষী হিসেবে তাদের স্বীকৃতি নেই, অথচ তারা তো চাষ-ই করে এসেছে জীবনভোর। ঘরের বাচ্চারা একটু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা, বাবা, কাকা, কাকীমা, দিদি, দাদার সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েছে এতকাল। অন্য কাজ ওরা শেখেনি। সিঙ্গুরের চাষ ভালো হওয়ায় বাইরে যাওয়ার কথাও ওরা ভাবেনি এতদিন।

এই অবস্থাটা সরেজমিন দেখলে যে কেউ অনুভব করবে, টাটার কারখানা স্থাপন সমাজের এই স্তরটার জন্য কতখানি ধ্বংসাত্মক।

দোবাঁদি গ্রামের ঘর-ঘর থেকে মেয়েরা কাকডাকা ভোরে উঠে এখন ধান রোয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ছে দূরদূরান্তে, দেড়-দু কিলোমিটার পথ হেঁটে নালিকুল পর্যন্ত তারা চলে যাচ্ছে কেউ কেউ। কিন্তু সরকারের জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ তাদের শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে চাইছে। চাষ থেকে উচ্ছেদ করে সেই ধ্বংসাত্মক, চূড়ান্ত অপূরণীয় ক্ষতির দিকেই প্রশাসন ঠেলে দিতে চাইছে এইসব খেতমজুর পরিবারগুলিকে। কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে এর মোকাবিলা সম্ভব? কোন পথে পরিত্রাণ? এই প্রশ্নেই আলোড়িত এখন দোবাঁদির মতো পাড়াগুলি।

সংযোজনী ১
টীকা ও সংজ্ঞা

খেতমজুর	মজুরীর বিনিময়ে যে অন্যের চাষের জমিতে দিনমজুর হিসেবে চাষের কাজ করে।
বর্গাদার	ফসলের ভাগের ভিত্তিতে যে অন্যের জমি চাষ করে। সিঙ্গুরে চাষের খরচ মূলত বর্গাদার নিজে বহন করে এবং ফসলের বা সমমূল্যের ২৫ শতাংশ জমির মালিক পায় এবং বর্গাদার ৭৫ শতাংশ পায়।
বড়ো চাষী	যে চাষীর জমির পরিমাণ ৫ হেক্টরের ওপরে।
মধ্যচাষী	যে চাষীর জমির পরিমাণ ৩ হেক্টর থেকে ৫ হেক্টর।
ছোটো চাষী	যে চাষীর জমির পরিমাণ ১ হেক্টর থেকে ৩ হেক্টর।
প্রান্তিক চাষী	যে চাষীর জমির পরিমাণ ০.৫হেক্টর থেকে ১ হেক্টর।
অতি প্রান্তিক চাষী	যে চাষীর জমির পরিমাণ ০.৫ হেক্টরের নীচে।
ভূমিহীন চাষী	যে চাষীর কোনো চাষের জমি নেই।
পাট্টাদার	যে চাষী অস্থায়ী ভাবে জমির পাট্টা বা দলিল পেয়েছে।

১ হেক্টর = ২.৪৭১ একর;
১ একর = ৩.৩ বিঘা;
১ বিঘা = ৩৩ শতক = ২০ কাঠা।

সংযোজনী ২
সিঙ্গুরে বিঘা প্রতি চাষের খরচ ও আয়ের গড়পরতা হিসেব [সমস্ত কাজ মজুর দিয়ে করালে]

ফসল	খরচ	ফলন	পুরোটা বিক্রি করলে আয়
আমন ধান	৩২০০ টাকা	৬ কুইন্টাল	৪২০০ টাকা
বোরো ধান	৪৫০০ টাকা	৮ কুইন্টাল	৬৪০০ টাকা
জ্যোতি আলু*	৭০০০ টাকা	৪০ কুইন্টাল	১২০০০–১৬০০০ টাকা
চন্দ্রমুখী আলু*	১১০০০ টাকা	৪৫ কুইন্টাল	১৮০০০–২৩০০০ টাকা

* বাণিজ্যিক ফসল আলুর এই হিসেব চাষ ভাল হয়েছে, বাজারও ভাল আছে ধরে নিয়ে।

সংযোজনী ৩
দোবাঁদি গ্রামের এক অনথিভুক্ত ভাগচাষীর বর্গা রেকর্ডের জন্য আবেদনপত্র

To
The BLRO
Singur, Hooghly

Through: R.I.O. , Beraberi

মাননীয়,
আমার বিনীত নিবেদন এই যে সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেড়াবেড়ি (দোবাঁদি) গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও কৃষক শ্রী বিশ্বনাথ মৈত্রী (পিতা সূর্যকান্ত মৈত্রী) বেড়াবেড়ি নিবাসী শ্রী অশ্বিনী কুমার দে (পিতা স্বর্গত সতীশ দে) মহাশয়ের বেড়াবেড়ি মৌজায় নিম্নবর্ণিত জমিগুলি ২০ বৎসর যাবৎ ভাগচাষ করিতেছি।

মহাশয়ের নিকট একান্ত প্রার্থনা যে আমি যাহাতে সমস্ত জমিগুলি বর্গা রেকর্ড পাই তাহার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি
আপনার বিশ্বস্ত
শ্রী বিশ্বনাথ মৈত্রী

১৭.১১.২০০৬

তফসিল পরিচিত জমি
মৌজা বেড়াবেড়ি

দাগ নং	পরিমাণ
২৪৩	০.০১ শতক
২৮৫	০.১৪ শতক
২৮৬	০.২৫ শতক
২৮৭	০.৩৪ শতক
২৮৮	০.২৮ শতক
মোট	১.০২ শতক

	মালিক পক্ষের নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১	অশ্বিনী কুমার দে	স্বর্গত সতীশ দে	বেড়াবেড়ি
২	স্বরূপ কুমার দে	স্বর্গত শঙ্কর দে	বেড়াবেড়ি
৩	অরূপ কুমার দে	স্বর্গত শঙ্কর দে	বেড়াবেড়ি
৪	চায়না দে	(স্বামী) স্বর্গত শঙ্কর দে	বেড়াবেড়ি

সংযোজনী ৪
সিঙ্গুরে জাতপাত ও গড়পরতা আর্থিক অবস্থা

জাত	পদবি	মৌজা/পাড়া/গ্রাম	গড়পরতা আর্থিক অবস্থা
ব্রাহ্মণ	চক্রবর্তী, ব্যানার্জি চ্যাটার্জি ইত্যাদি	গোপালনগর, বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া	স্বচ্ছল
কায়স্থ	ঘোষ, বসু ইত্যাদি	গোপালনগর	স্বচ্ছল
মাহিষ্য	বারুই	গোপালনগর বারুইপাড়া, খাসেরভেড়ি	বেশ অবস্থাপন্ন
মাহিষ্য	দাস	বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া	স্বচ্ছল
মাহিষ্য	মান্না	বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়া	স্বচ্ছল
মাহিষ্য	সাও	গোপালনগর সাওপাড়া, পূর্বপাড়া	মধ্যবিত্ত
মাহিষ্য	সাহানা	গোপালনগর সাহানাপাড়া	মধ্যবিত্ত
মাহিষ্য	কোলে	বাজেমেলিয়া, বেড়াবেড়ি মধ্যপাড়া	সাধারণ
মাহিষ্য	সাঁতরা	বেড়াবেড়ি	সাধারণ
মাহিষ্য	পাল	বেড়াবেড়ি	সাধারণ
গোয়ালা	ঘোষ	গোপালনগর ঘোষপাড়া, বেড়াবেড়ি ঘোষপাড়া, বাজেমেলিয়া, খাসেরভেড়ি	অবস্থাপন্ন
শুঁড়ি/বণিক	সাহা	বেড়াবেড়ি সাহাপাড়া, বাজেমেলিয়া, গোপালনগর	বেশ অবস্থাপন্ন
বাগদি (বর্গক্ষত্রিয়)	পাত্র, মালিক, হাম্বীর	জয়মোল্লা, বেড়াবেড়ি মধ্যপাড়া ও পূর্বপাড়া, বাজেমেলিয়া, যমপুকুর	সাধারণ
দুলে	মাল	মালপাড়া, বাজেমেলিয়া	মধ্যবিত্ত
বাউরি	মৈত্রী, পাত্র, বাগালি ইত্যাদি	দোবাঁদি, হোটেলধার, দলুইগাছা	অতি সাধারণ
চর্মকার	রুইদাস	রুইদাসপাড়া	অতি সাধারণ
মুসলমান		জয়মোল্লা, কিসমত যমপুকুর	সাধারণ